পার্থসারথি

"গীতারত্ন" শ্রীপ্রীতিকুমার ঘোষ প্রবর্তিত ধর্ম ও জাতীয়তাবাদী বাংলা মাসিক পত্রিকা (৬৭তম বর্ষ)

(মুদ্রণ : জুন, ১৯৬০ থেকে মার্চ, ২০২০ / আন্তর্জাল : এপ্রিল, ২০২০ থেকে)

৭৫ তম অন্তর্জাল সংখ্যা

৯ই আষাঢ়, ১৪৩৩ / 24.06.2026

-ঃ সম্পাদক ঃ-

সুনন্দন ঘোষ

https://www.parthasarathipatrika.com

-: সূচীপত্র :-

(৭৫তম অন্তর্জাল সংখ্যা)

প্রীতি-কণা	শ্রীপ্রীতিকুমার ঘোষ
আত্ম-কথা	শ্রীমতী শুক্লা ঘোষ
জীবন নিয়ন্ত্রণ	শ্রীমা
চিন্তা দহতি জীবম্ চিতা দহতি নির্জীবম	শ্রীবীরেশ্বর প্রসাদ বক্সী
যোগবাণী	পরমহংস যোগানন্দগিরি
উপনিষদের মর্মবানী	শ্রীমতি নমিতা রায়চৌধুরী
সুইজারল্যান্ডের দুই পাহাড়ে	শ্রী অরূপ কুমার ভট্টাচার্য্য
সতর্কতা	শ্রী সুনন্দন ঘোষ

Founded by Sri Priti Kumar Ghosh in June, 1960, PARTHASARATHI Bengali Monthly Magazine, RNI 5158/ 60, published in print format for sixty years, thereafter converted to e-magazine by Sri Sunandan Ghosh, Editor & Publisher in April, 2020 during prolonged Nationwide Lockdown and to be published in the Website: https://www.parthasarathipatrika.com

Contact: 182 Jessore Road, Flat- D/1, Kolkata- 700074. WhatsApp: 8910977590.

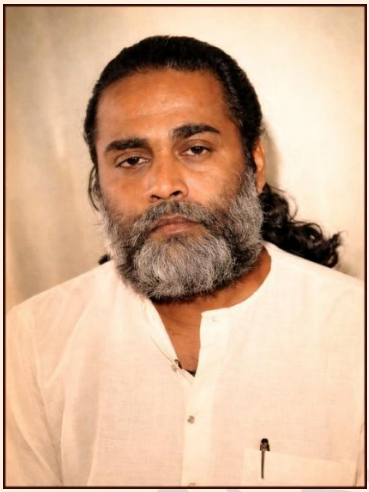

[১০.০৩.১৯২৬ – ২৪.১১.১৯৮৬]

প্রীতি-কণা

"এই বিশ্বটাই ভগবানের কর্মলীলা। এই দিব্যকর্ম করতে হবে আত্মসংযমের দ্বারা। আত্মসংযম বলতে নিগ্রহ নয়। জোর করে ইন্দ্রিয়গণকে বিষয় থেকে নিবৃত্ত করলেই আত্মসংযম হয় না। মনকে ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়ে লাগিয়ে রেখে ফলের আকাঙ্ক্ষা নিয়ে কর্ম করাই আসক্তি এবং আসক্তি বর্জন করে কর্ম করাই কর্মযোগের মূল কথা।"

এই সংখ্যাটি যখন প্রকাশিত হবে তখন বাচেন্দ্রী একবছর পূর্ণ করে ফেলবে। ১৯৯৩ সালটা আমার মনে হচ্ছে খুব তাড়াতাড়ি কেটে গেল। আসলে এত ঘটনাবহুল যে সময় কোথা দিয়ে কেটে গেছে বুঝতে পারিনি।

পড়াশুনা করব ঠিক করেছিলাম। বাচেন্দ্রীর দুষ্টুমীর জন্য কাগজ কলম বই নিয়ে বসতে পারি না। যেটা আমার হাতে থাকে, সেটাই ওর দরকার। সেলাই করতে বসলে ছুঁচ ধরে টানাটানি, উল বুনতে বসলে কাঁটা ধরে টানাটানি। কি করব বুঝতে পারি না। তাই অফুরন্ত অবসর বলতে যা বোঝা যায়, তা আর আমার জীবনে নেই।

আমি গত কয়েক বছর ধরে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘে যাতায়াত করি। শ্রীপ্রীতিকুমার থাকতে কখনও যাইনি। তিনিই যেতেন। তাছাড়া ওখানকার স্বামীজীরা আমাদের বাড়ীতে আসতেন। আমরা বাইরে গেলে শ্রীপ্রীতিকুমার আমাদের ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘে থাকতে নির্দেশ দিতেন। এই সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী প্রণবানন্দজী সম্বন্ধে আমার খুব বিশদভাবে জানতে ইচ্ছে করে। তাঁয় সংস্পর্শে যে সব স্বামীজীরা এসেছেন, তাঁদের সময় হবে কিনা জানি না। তাই কিছু জিজ্ঞেস করিনি কোনও দিন। স্বামী প্রণবানন্দজী সম্বন্ধে বলতে পারেন ডঃ হরিপদ চক্রবর্তী। আমার খুব ইচ্ছে ছিল তাঁর কাছে গিয়ে কিছু তথ্য সংগ্রহ করে ফেলব। তিনি এখানে যখন Bankura Rural Development Authority-তে আসেন তখন আমাদের সাথে দেখা করতে এসেছিলেন। তখন তাঁকে অনুরোধ করেছিলাম যদি স্বামী প্রণবানন্দজী সম্বন্ধে তিনি আমাকে কোনও তথ্য জানান, তাহলে আমি তাঁর বাড়ীতে গিয়ে তথ্য সংগ্রহ করব। ডঃ হরিপদ চক্রবর্তী আমাকে সে সময়ে বলেছিলেন তিনি অন্য কাজে ব্যস্ত থাকবেন। সময় হলে তিনি আমাকে Phone করবেন। ৯৩ সাল চলে গিয়ে ৯৪ সাল এসে গেল। কিন্তু তাঁর Phone আর এলো না, হয়ত তিনি আমাদের ভুলেই

গেছেন। কত ইচ্ছে অপূর্ণ থেকে যায়। আমারও তো বয়স হোল। যাবার আগে ডঃ হরিপদ চক্রবর্তীর কাছ থেকে শুনে স্বামী প্রণবানন্দজী মহারাজের ব্যক্তিগত জীবনের কাহিনী শুনে লিপিবদ্ধ করতে পারব কি? অপেক্ষা করে আছি কবে তাঁর ডাক আসবে - কবে তিনি আমাকে টেলিফোন করবেন।

শ্রীপ্রীতিকুমারের স্মৃতির উদ্দেশ্যে আমরা গত ২৪শে নভেম্বর একটি অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করেছিলাম। এসেছিলেন শ্রীমতী জয়শ্রী মুখোপাধ্যায়, শ্রীমতী কল্পনা গোস্বামী ও কুমারী শ্রদ্ধাপূর্ণা গোস্বামী। শ্রীমতী জয়শ্রীর ভক্তিগীতি সমস্ত শ্রোতাকে দীর্ঘক্ষণ আবিষ্ট রেখেছিল। কল্পনাদি এসেছিলেন প্রায় একঘণ্টা দেরীতে। ফলে সন্ধ্যা ৬টা থেকে ৭টা পর্যন্ত আসর জমিয়েছিল দোলন, ঝুম্পা (পারিজাতদার নাতনী) ইত্যাদি। শ্রদ্ধাও অপূর্ব ভজন ও নজরুলগীতি গাইল। কল্পনাদির কীর্তন যেন সমস্ত পরিবেশটাকে মাতিয়ে দিয়েছিল। মনে হচ্ছিল শ্রীপ্রীতিকুমার থাকতে শুধুতো চীৎকার চেঁচামেচি করে গেলাম। যদি একটু কীর্তন গাইতে পারতাম, কত খুশী হতেন। ভীষণ গান ভালোবাসতেন। আমি গান শিখেছি দীর্ঘদিন। কিন্তু একলা বসে তাঁকে আলাদা করে কোনও দিন গান শোনাবার কথা আমার মনেও আসেনি। আসলে আমাদের সঙ্গে থাকবার তাঁর সময় ছিল না। পুত্রকে একটু স্নেহ দেখালেই অন্য লোকের কপাল চড়চড় করে উঠতো। উনি আবার রাত্রে বাড়ী এসে সেগুলি রসিয়ে রসিয়ে গল্প করতেন।

কয়েকদিন আগে University-তে গেছিলাম। মনে হোল পারিজাতদাকে একবার দেখে আসি। দেখলাম সত্যি শরীর খারাপ। হাসিমুখে কথা বললেন। বাপীকে একবার যেতে বললেন। একটা কথা বললেন- "ওরকম লোক আর দেখলাম না। যা বলে দিতেন, একেবারে সঠিক। একটু নড়চড় হোত না।" এই পারিজাতদার সঙ্গে সঙ্গে একটি অধ্যায় শেষ হয়ে যাবে। কত বছর ধরে শ্রীপ্রীতিকুমারের সাথে সাথে থেকেছেন। কি ভাবে সেবা করেছেন তা চোখে না দেখলে বুঝতে পারতাম না। চিরকাল কালী পূজার সময় পারিজাতদাকে দেখেছি বঁটি পেতে বসে ঠাকুরের

ফল কাটতে। কি নিষ্ঠা ছিল। একটুও বিরক্ত হতেন না। আমরা এই ফল কাটা নিয়ে কি হাসাহাসি না করেছি! খুব পাকা হাত না হলে ঐ অত ফল এক আসনে বসে একসাথে কাটা যায় না।

শ্রীপ্রীতিকুমারকে অনেকে অনেক ভাবে সেবা করেছেন। অনেকে মাস-বছর হিসেব করে পারিজাতদার থেকে Senior বা সমকালীন ভক্ত বলে দাবী করেন। কিন্তু আমি যা চোখে দেখেছি তা ভুলব কি করে? টাকা দিয়ে পৃথিবী কেনা গেলেও মানুষের হৃদয় তো কেনা যায় না।

আমি অনেক সাধারণ মানুষদের দেখেছি শ্রীপ্রীতিকুমারের কাছে। তাদের কারো কারো সাথে সে সময় আমি বেশী মেলামেশা করিনি। আবার কাউকে কাউকে বিচার করবার চেষ্টা করিনি। শ্রীপ্রীতিকুমার প্রয়াত হবার পর দেখেছি তাঁরা আমাকে কত যত্ন করেন। কত হাসি মুখে আমাকে আপন করে নিতে চান। ধীরে ধীরে আমিও তাদের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছি।

আমার বড়দিনের ছুটি এসে যাচ্ছে। যদি দুদিনের জন্য কটকে মঞ্জুদির কাছে যেতে পারতাম, আমারও ভালো লাগতো, মঞ্জুদিও খুশী হতেন। কিন্তু আমি তো লক্ষ্ণৌর টিকিট কেটে ফেলেছি। একটা টিকিট সব সময় আমার ব্যাগে থাকে। আমি দেখেছি যখনই "ক" বর্গের কারো কাছে কোথাও যাবার কথা ব্যক্ত করি আমার আর যাওয়া হয় না।

গুজরাট ভ্রমণের কথা লিখব ভাবছিলাম। সেতো মনে করে করে লিখতে হবে। আর কলম ধরলে বাচেন্দ্রীর সেই কলমটি চাইই। না পেলে এমন চীৎকার করবে, ইচ্ছে করে ঠাস ঠাস করে গালে দু-চারটি চড় দিয়ে শুইয়ে দিই। কিন্তু যতক্ষণ আবার আমিই কোলে না নেব - কান্না থামাবে না। বাচেন্দ্রীর একবছর পূর্ণ হোল। এখনও কথা বলতে শেখেননি, কিন্তু "দাদা দাদা" ডাকে বাড়ী গমগম করছে।

শ্রীপ্রীতিকুমারের Photo দেখলে ওর মুখটা খুশীতে ঝলমল করে ওঠে। কি ভালোবাসে দাদুর বিছানায় শুতে। যে কোনও বিছানায় বসলেই তিনি হি... করে ফেলেন কিন্তু দাদুর বিছানায় এখনও একবারও কিছু করেন নি। কারণটা আমিও বুঝতে পারি না। বাপী একবার বলেছিল – "বাবার কোনও একটা ব্যাপার আছে। ইচ্ছে করে তোমাকে বিরক্ত করে।"

সামনে আবার শ্রীপ্রীতিকুমারের জন্মদিন আসছে। আমরা গত সাত বছর ধরে সঙ্গীতানুষ্ঠানের মাধ্যমে শ্রীপ্রীতিকুমারের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করি। সামনের ১০ই মার্চ যদি কোনও নতুন কণ্ঠে সঙ্গীত শোনবার ব্যবস্থা করা যেতো ভালো হোত। দেখা যাক কি হয়। জোর করে তো কাউকে দিয়ে কিছু করানো যায় না। আমি গোটা ব্যাপারটা তাঁর উপরই ছেড়ে দিয়েছি। তিনি যেমন ভাববেন, তেমনই হবে। আমার বিশ্বাস তাঁর ব্যবস্থা তিনি নিজেই করিয়ে নেবেন।

এবার আমার দ্বারকা দর্শনের বর্ণনা করবার কথা ছিল, কিন্তু সময়াভাবে সেটা হোল না। আশা করি একটু সময় করে সে কাহিনী লিখতে পারব। আপাততঃ এখানেই। .....

(** রচনাকাল – ডিসেম্বর, ১৯৯৩)

"যিনি অপরের জন্য বাঁচেন, তিনিই কেবল জীবিত; আর যারা নিজের জন্য বাঁচে, তারা জীবিত থেকেও মৃত।"

স্বামী বিবেকানন্দ

আভ্যন্তরীণ সত্তার উন্নতির জন্য নৈতিক ভাবধারণার কোন সম্বন্ধ নাই। ওই দুটির যোগাযোগ বেশ সঙ্গতিপূর্ণ নয়। তাদের প্রেরণা বিভিন্নমুখী। একান্ত স্বার্থশূন্য কাজ করে লোকে হয়ত একেবারে অসুস্থ হয়ে পড়তে পারে, অথচ নিতান্ত স্বার্থপূর্ণ কাজ করেও লোকে সুস্থ সবল থাকতে পারে।

নৈতিক চেতনা এবং সত্যের প্রকটনকারী চেতনার মধ্যে অনেক প্রভেদ আছে। নৈতিক চেতনা লাভ করার অপেক্ষা সত্যের প্রকাশকারী চেতনা অর্জন করা অনন্তগুণ দুঃসাধ্য। কারণ, কোন এক নির্বোধ ব্যক্তি যে সামাজিক বিধি নিষেধ জানে এবং সেই সব মেনে চলে সে-ও নৈতিক চেতনা লাভ করতে পারে, কিন্তু সত্য চেতনা লাভ করতে হলে নির্বোধ হওয়া চলবে না; উহাই প্রথম শর্ত।

জীবনে দুর্ভাগ্য আসে তার কারণ লোকে তাদের জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে না। পলে পলে মানুষ জীবন যাপন করে, যা কিছু ঘটে তা যেমন তেমন ভাবে গ্রহণ করে। অথবা লোকে মানসিক নিয়ন্ত্রণ করে যার সহিত সত্যের মিল নাই। তাই প্রতি পদে মানুষের চেষ্টা ব্যাহত হয়। কিন্তু মানবজীবন যদি উচ্চতর নীতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, জীবন যদি অন্ধকারে হাতড়ে বেড়ান না হয়, অর্থাৎ প্রতি মুহূর্তে যদি বিশিষ্ট নির্দেশ নিয়ে কী করা উচিত এবং কেমন করে তা করা উচিত তা নির্ধারিত করা হয়, তাহলে সব সুব্যবস্থাই করা যেতে পারে; কোন দুর্ঘটনাই তখন ঘটবে না।

সাধারণ ভাবে বলা যায় যে প্রত্যেকেরই উচিত আপন আপন কাজ বেশ চিন্তা করেই পছন্দ করে নেওয়া, যে-কাজ করতে সক্ষম সেই কাজই গ্রহণ করা এবং তা সুসম্পন্ন কর।। প্রায়ই আমরা অত্যধিক কাজ লই এবং ঐ অত্যধিক

কাজের মধ্যে অনেক কিছুই থাকে যা অপ্রয়োজনীয় এবং যা বাদ দেওয়া যায় বা বিশেষ ভাবে কমিয়ে ফেলা যায়। কর্মের পরিণতির কোন ব্যতিক্রমই তাতে হয় না। ইহা একটা সার্বজনীন বিধান নয়, ইহা আমার একটা অভিজ্ঞতা মাত্র। অন্তরের নির্দেশই অনুধাবন করতে হয় এবং বাইরের ঢেউয়ের দ্বারা চালিত হতে অস্বীকার করতে হয়। বাইরের থেকে আসে অন্য সব লোকের সঙ্কল্পের ঢেউ, বিরূদ্ধশক্তি সমূহের আক্রমণ, গতানুগতিক পরিবেশের প্রভাব ইত্যাদি। কার্য সম্পাদনের পথে তারা বাধা সৃষ্টি করে। অসহায় ভাবে এদিকে সেদিকে বিক্ষিপ্ত না হয়ে যদি তুমি অন্তরের সুস্পষ্ট, সুনির্দিষ্ট নির্দেশ অনুযায়ী কাজ কর, কোনরকম ইতস্তত বা এড়িয়ে যাবার চেষ্টা না করে, যথার্থভাবে তোমার কাজ করে যাও, যদিও তোমার কাজে অন্যরা অসন্তুষ্ট হতে পারে, কিন্তু যার খুশী অসন্তুষ্ট হোক তাতে বিচলিত না হয়ে তুমি যদি তোমার কর্তব্য করে যাও, তাহলে তুমি তোমার অবস্থার উপর একধরণের প্রভুত্ব লাভ করবে, এবং বাইরের অবস্থা তোমার অনুকূল হবে, তুমি তখন অল্প সময়ে অনেক বেশী কাজ করতে পারবে।

অল্প সময়ে একটি কাজকে সুসম্পন্ন করার জন্য চাই একাগ্রতা। অনেক লোক আছে যারা কাজের মধ্যে একাগ্রতা আনতেই পারে না; তারা ক্লান্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু একটি ভার বহন করার মত একাগ্রতা করতে লোকে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। সুতরাং, প্রথমতঃ চাই একাগ্রতার উপর কর্তৃত্ব, এবং তার জন্য চাই মনকে শান্ত করা, এই ঐ শান্তির মধ্যে একাগ্রতা আনা। যে কাজ করতে হবে তার উপর একাগ্র হতে হয়, তা সে যে কাজই হোক না কেন। একাগ্রতা এক কার্যকরী শক্তি সাথে নিয়ে আসে। সে শক্তি শান্ত কিন্তু অত্যন্ত শক্তিশালী। ঐ শক্তি সাথে নিয়ে তুমি বিনা দ্বিধায় অগ্রসর হতে পার। ঐ শক্তি এবং একাগ্রতার সাহায্যে তুমি পনের মিনিটে

সেই কাজ করতে পার যা করতে সাধারণতঃ এক ঘণ্টার প্রয়োজন হয়। ঐরূপে অনেক সময় বেঁচে যায়, এবং এক কাজ থেকে অন্য কাজে ছোটাছুটি না করে তুমি কিছুক্ষণ পরিপূর্ণ বিশ্রামের সময় পেতে পার। বিশ্রাম করলে দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মধ্যে শিথিলতা আসে। কর্মক্লান্ত দেহ শান্ত হয়। দেহের মধ্যে আসে নূতন শক্তি এবং পুনরায় আর একটি নূতন কাজে মনোযোগ দিতে পারা যায়।

**(শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমের সৌজন্যে)

চিন্তা দহতি জীবম্ চিতা দহতি নির্জীবম **শ্রীবীরেশ্বর প্রসাদ বক্সী**

যখন জীবের দেহাবসান হয় তখন সে হয় "নির্জীব"। অর্থাৎ জীবের জীবনের পরিসমাপ্তি। 'যিনি' জীবকে জীবনদান করেন ও দেহান্তকালাবধি প্রাণ সিঞ্চনরূপে জীবদেহে বর্তমান থেকে জীব দেহকে সজীব রাখেন 'নির্জীব' অর্থে 'তাহারই' অন্তর্ধান। পাঁচরঙ্গা পরিচ্ছদে সজ্জিত তনুর তখন আর কোনও মূল্য থাকে না। আত্মীয় স্বজনের ক্রন্দন রোল হয় ব্যর্থ। পরিশেষে চিতানলে ভস্মীভূত হয়ে পাঁচরঙ্গা তনু মিশে যায় পঞ্চভূতে। জীবিত কালে যে লৌকিক রূপের অনুশীলনে মানবের স্বাতন্ত্র, মুক্ত শুষ্ক অবহেলিত হয়ে সেই রূপের হয় চির অবসান।

'চিতা দহতি নির্জীবম্' - এই বাক্যের ইহাই তাৎপর্য্য। এই তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করতে পারলে, জীবের উপলব্ধি হবে এই তনু মিথ্যা পাঁচ রঙ্গা পরিচ্ছদ

মাত্র, ধন মান যৌবনের গর্ব্ব করা বৃথা, লৌকিক-রূপের অনুশীলনে নিজেকে ব্যপৃত রাখা উচিৎ নয়, আমিত্বের প্রসারের জন্য লোলুপতা সতত বর্জনীয়, আত্মনিষ্ঠ হয়ে স্বাতন্ত্র্য লাভ ও ভগবদর্চ্চনা জীবনের পরম লক্ষ্য।

"চিন্তা দহতি জীবম্" - নির্জীব যেমন চিতাগ্নিতে দগ্ধ হয়, সেইরূপ জীব চিন্তানলে দগ্ধ হয়। ফলে উর্দ্ধ গতির (পরমাত্মার সান্নিধ্য লাভের) পথ হয় রূদ্ধ, অধোগতির পথ উন্মুক্ত। অপরিসীম চিন্তা মানব জীবনকে বিপর্যস্ত করে আনয়ন করে বিভ্রান্তি, সে হয় লক্ষ্য ভ্রষ্ট। লক্ষ্য ভ্রষ্ট অবস্থা চিন্তানলে দগ্ধ হওয়ার পরিণাম।

"চাহ্ গই চিন্তা মিটি, মনুয়া বেপরবাহ্। জিনকি কছু ন চাহিয়ে ওয়ে শাহন শাহ্।" চাহ্ অর্থে ইচ্ছা, যার মনে ইচ্ছা বাসা বাঁধতে পারে না, যার মন থেকে ইচ্ছা লোপ পায়, তার মনে কোনও রূপ চিন্তা থাকতে পারে না। চিন্তার প্রবাহ রূদ্ধ হলে জীব সন্তোষ লাভ করে, চিত্ত হয় প্রসন্নোজ্বল। যার মনে সন্তোষ বিরাজ করে-সে বাদশাহ তুল্য। চিন্তাই সব অনর্থের মূল। যে ব্যক্তি এই অনর্থকারী চিন্তাকে ধ্বংস করতে সফল হয়, সে ব্যক্তিকে চিন্তানল দগ্ধ করতে পারে না। চিন্তাই কামনা বাসনা, তৃষ্ণা, অভাব অভিযোগ, ক্রোধ ও লোভের জনক।

চিন্তানলে দগ্ধ হবার অর্থ হচ্ছে কামনা বাসনার লেলিহান শিখায় নিজেকে সম্পূর্ণরূপে আহুতি দেওয়া। অন্তকালাবধি অপরিমেয় কামনা ও দুরাশার বশবর্তী হয়ে, ধন মান ও মদে মত্ত হয়ে শাস্ত্র বিরুদ্ধ অশুচি পথাবলম্বন।

সংকল্প বা মতলবই চিন্তার মূলাধার। সংকল্প বা মতলব সাধারণ জীবের অতীব প্রিয়। তাই বলা হয় "মতলব প্যারা হ্যায়"।

এই সংকল্প বা মতলবের হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়া খুবই দুষ্কর। একমাত্র তিনি পারেন, যিনি আত্মানুসন্ধানে সাফল্য লাভ করেন ও চিত্তকে সমস্ত কামনা বাসনা হতে বিনির্মুক্ত করবার নিমিত্ত সচেষ্ট হয়েন।

যখন চিন্তার দহনে জীব দগ্ধ হয় তখন তাহার সম্মুখে অসত্যও সত্য বলে প্রতিভাত হয়, অন্ধকারের যবনিকা আলোককে করে অপসৃত, আত্মার অমৃতত্ব হয় লুপ্ত।

স্বরূপোলব্ধি পরমাত্মাভিমুখী জীবের কাম্য। স্বরূপোলব্ধি হলে পরম-পুরুষোত্তমের রাজ্যে প্রবেশাধিকার অর্জিত হয়। কিন্তু কামনা বাসনার মোহজালে সমাবৃত থাকার দরুণ পরমাত্মার রাজ্যে প্রবেশাধিকার থেকে জীব বঞ্চিত হয়। ইহাই পূর্ব্বোল্লিখিত চিন্তানলে দগ্ধ হওয়ার পরিনাম।

চিন্তা দ্বিবিধ সৎ ও অসৎ। অসৎ চিন্তার দ্বারা প্রভাবান্বিত হলে অপূরণীয় কামনা বাসনার উদ্রেক হয় ও পূর্ব্বোক্ত রূপে জীবকে দগ্ধীভূত করে, পরিণামে মানবত্ব লোপ পায়, সুতরাং অসৎ চিন্তা সর্ব্বতোভাবে বর্জন করে সৎ চিন্তার অনুশীলন করা প্রতি নরনারীর কর্ত্তব্য। সৎ চিন্তায় ঊর্দ্ধগতি, অসৎ চিন্তায় অধোগতি।

সৎ চিন্তা অসৎ চিন্তার ন্যায় জীবকে দগ্ধীভূত করে না, বরং জীবের "জীবন" লাভের সহায়ক হয়, যে জীবন লাভের ঐকান্তিক স্পৃহা অধিকাংশ মানব হৃদয়ে চির জাগ্রত।

সৎ গ্রন্থ পাঠ, সৎ সঙ্গ, সৎ আলোচনা, সৎ প্রসঙ্গ, সৎ চিন্তার মুলাধার।

সর্ব্বোপরি সদ্গুরুর আশ্রয় ও তাঁহার কৃপা লাভ।

অসৎ চিন্তার কবল হতে মুক্ত হবার নিমিত্ত অতন্দ্র ও অনলস সাধনার প্রয়োজন। সাধনার দ্বারা নিজেকে প্রস্তুত করতে সক্ষম হলে চিন্তানল হতে অব্যাহতি, অন্যথায়

চিন্তানলের লেলিহান শিখায় আহুতি ও জীবনের চরম লক্ষ্য হতে বিচ্যুতি।

যোগবাণী **পরমহংস যোগানন্দগিরি**

অনুবাদঃ স্বামী বিদ্যানন্দ গিরি

সুখ কি?

জগতে বিভিন্ন প্রকৃতির মানুষ দেখা যায়, সৎ অসৎ, অস্থির সুস্থির, অজ্ঞ বিজ্ঞ, সুখী দুঃখী। অসৎকে যদি সৎপথে চলিবার উপদেশ দাও, চঞ্চলতা দূরীকরণের জন্য যদি ধ্যানপরায়ণ হইবার কথা বল, তবে সে হয় অসামর্থজ্ঞাপন করিবে অথবা তোমাকে বুঝাইয়া দিবে সে তোমার উপদেশ অনুসরণ করিতে অনিচ্ছুক। পূর্বের সংস্কার বা অভ্যাসবশতঃই কেহ কেহ এরূপ করে। মানুষ যে সৎপথ অবলম্বন করিতে চায় না, এমন নহে।

যদিও সুখ বাহ্য অনুকূল অবস্থার উপর কিয়ৎ পরিমাণে নির্ভর করে, কিন্তু উহা প্রধানতঃ অন্তরের গভীর প্রশান্তি হইতেই উৎপন্ন হয়। সাধারণতঃ বহিরিন্দ্রিয়গুলি মানুষকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে, এজন্য মানুষ বহিরিন্দ্রিয়জাত সুখের প্রতি এত আকর্ষণ বোধ করে এবং ঐ সুখের নেশায় আবদ্ধ হইয়া পড়ে। কেহ কেহ কারাজীবনে অভ্যস্ত হইয়া যেমন সারাজীবন কারাগৃহে বন্দী হইয়া থাকিতে চায়, মরজগতের জীব আমরাও তদ্রূপ জাগতিক সুখে আবদ্ধ থাকিতে চাই এবং অন্তরের আনন্দময় আভ্যন্তরীন দরজা বন্ধ করিয়া দেই।

অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইন্দ্রিয়জাত সুখ স্বল্পকাল কোন নেশায় বিমোহিত করিয়া রাখে, কিন্তু ইহার ফলে মানুষকে চিরদিনের জন্য মহা দুঃখের সম্মুখীন হইতে হয়। অন্যপক্ষে হৃদয়ের ধর্ম ধ্যানজাত আন্তরিক সুখানুভব প্রথমে ক্ষীণ বোধ হইলেও পরিণামে সর্বক্ষেত্রে পরম শান্তি ও আনন্দ দান করে। অন্তরের গভীর প্রদেশ হইতে সমুত্থিত চিরস্থির সুখই 'আনন্দ' নামে অভিহিত। ইন্দ্রিয়জাত ক্ষণস্থায়ী ও অস্থির সুখোন্মাদনা সাধারণ ভাষায় স্ফূর্তি বা আমোদ। ইন্দ্রিয়সুখের উন্মাদনায় প্রমত্ত হইয়া মৃত্যুপথগামী হওয়ার চেয়ে নিজের অজ্ঞানতাজনিত দুঃখে দুঃখিত হইয়া থাকা বরং শ্রেয়ঃ।

যেখানে যে অবস্থায়ই থাকা যায় মানবীয় চিন্তাধারা, অনুভূতি ও অন্তর-জ্ঞান জাগ্রত ও উদ্দীপ্ত করিয়া রাখাই কল্যাণের পথ। অসৎ দৃষ্টান্ত ও মানুষের মন্দ আচার আচরণ সর্বদা উপেক্ষা করিয়া চলিবে এবং কুশলী ফটোগ্রাফারের মত নিজের মনে আদর্শ জীবনের ছবি তুলিয়া রাখিবার জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকিবে।

দৃঢ় ও পূতচরিত্র ব্যক্তিরাই সাধারণতঃ সবচেয়ে সুখী। তাঁহারা জাগতিক দুঃখ ক্লেশের সম্মুখীন হন, কিন্তু নিজের দুঃখ ক্লেশের জন্য তাঁহারা অন্য কাহাকেও দায়ী করেন না। নিজ নিজ কর্ম ও অজ্ঞানতার ফলেই সাধারণতঃ মানুষের দুঃখ ক্লেশ উৎপন্ন হয়। একজনের সুখসমৃদ্ধি বৃদ্ধি করিবার ক্ষমতা অন্য কাহারও নাই। মানুষ যদি নিজের দুর্বলতাবশতঃ অন্য কাহারও কুচিন্তা ও কুকর্মের সহিত সহযোগিতা না করে, তবে কেহ তাহাকে নিজের প্রশান্তি ও সুখ হইতে বিচ্যুত করিতে পারে না।

আত্মধ্যানজাত আনন্দই প্রকৃত সুখ। এই সুখ ব্যতিরেকে এই বৃহৎ জগতে বাস করা এক অর্থে বিশাল রাজপ্রাসাদে দুঃখক্লেশের মধ্যে বন্দী জীবন যাপন করা মাত্র, বুঝিতে হইবে। সুখ কেবল জীবনের সাফল্য আর সঞ্চিত ধনরত্নের উপর নির্ভর করে না। নিরবচ্ছিন্ন আত্মিক আনন্দ সঞ্চয় করিয়াই প্রকৃত সুখের মুখ দেখিতে পাওয়া যায়। জীবনপথে নানারূপ বিঘ্ন, বিফলতা, বিপদ ও সমস্যা উপস্থিত হইবে; ঐ সকলের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াই প্রকৃত সুখ অর্জন করিতে হইবে। ইহা অতি বড় কঠিন যুদ্ধ হইলেও এইরূপ চেষ্টায় বিরত থাকিলে বা ক্লেশবোধ করিলে লক্ষ্যবস্তুই নষ্ট হইয়া যাইবে। আদর্শ জীবন লাভের জন্য প্রচণ্ড লড়াই করিতে করিতে অগ্রসর হইলেও তাহাতে সুখ আছে, শান্তি আছে। অন্তর্জগৎ গভীর আনন্দের ভাবধারায় পূর্ণ কর, সাধন-সাহায্যে অন্তরের গভীরে তাহা উপলব্ধি কর। তাহা হইলে বহির্জগতের ক্ষণস্থায়ী সুখের চেয়ে ঐ চিরস্থির আনন্দধারা অধিক মাত্রায় ভাল লাগিবে।

প্রকৃত সম্পদ কি?

সর্বাগ্রে জীবনের উদ্দেশ্য জানিতে হইবে। মানুষের দৈহিক, মানসিক ও আত্মিক প্রয়োজনের বস্তু সামঞ্জস্যরূপে আহরণের মধ্যেই প্রকৃত উন্নতির বীজ বিদ্যমান। কিরূপে এহবিধ সামঞ্জস্য বিধান করিয়া উন্নত হইতে হইবে, এই জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। মানসিক বৃত্তির উৎকর্ষ সাধনেই প্রকৃত উন্নতির পথ উন্মুক্ত হয় এবং এই উৎকর্ষ সাধনের দ্বারাই প্রয়োজনের বস্তু আহরণ করা যায়। মানুষের যাহা যথার্থ প্রয়োজন আর সে যাহা পাইতে চায়, ইহার মধ্যে অনেক পার্থক্য।

চিত্ত বিক্ষেপকারী উপাদান সমূহ হইতে মনোযোগ প্রত্যাহৃত করিবার কৌশল আয়ত্ব হইলে এবং মনপ্রাণ এক লক্ষ্যে স্থির করিতে পারিলে, তোমার যাহা

প্রয়োজন তাহা ইচ্ছামাত্র পাইবার জ্ঞান সঞ্চিত হইবে। স্থির-প্রাণে সব কিছুর জ্ঞান উৎপন্ন হয়, অন্তরে সাড়া পাওয়া যায়। এইরূপ আত্মিক জাগরণই মানুষের প্রকৃত সমুন্নতির অবস্থা।

যে সকল বস্তু তোমার সমগ্র জীবনে একান্ত প্রয়োজন, সে সকলের উপর তোমার ইচ্ছামাত্র অধিকার জন্মিলেই বুঝিতে হইবে, তোমার প্রকৃত সমৃদ্ধি হইয়াছে। কিন্তু অল্প লোকই তাহাদের নিজ নিজ প্রয়োজন বিষয়ে অবহিত আছে। খুব অল্প লোকই প্রয়োজনের উদ্দেশ্য সম্যক বুঝিতে পারে। যদি কয়েকটি নির্দিষ্ট বস্তুর মধ্যে নিজের প্রয়োজন সীমাবদ্ধ করা যায়, তাহা হইলে সহজেই তাহা মিটানো যায়।

ধন সম্পদ অভিশাপ নয়। কিরূপে অর্থ বা ধনসম্পদের সদ্ব্যবহার করিতে হইবে, ইহাই প্রধান কথা। অর্থের দ্বারা বিষ ক্রয় করিলে কিম্বা অন্যরূপে অর্থের অপব্যবহার করিলে, জীবনে দুঃখ ভোগ করিতে হইবে। আবার অর্থের সদ্ব্যবহার করিলে, তাহাতে প্রচুর আনন্দলাভ করিবে। মুনিঋষি, সাধুসন্ত এমন কেহ নাই, যাঁহারা প্রয়োজনবোধে অর্থের ব্যবহার করেন না। শরীর ধারণের জন্যেও অর্থের প্রয়োজন আছে। সুতরাং অর্থ কেবল অনর্থ সৃষ্টি করে, এমন নহে। সব বস্তুরই মূল্য আছে।

অধিকাংশ লোক অর্থোপার্জনের জন্য তাহাদের সমস্ত শক্তি নিয়োগ করে। অনেকে বিপুল অর্থ সঞ্চয় করে, কিন্তু এই সাফল্য ও সুখের স্তরে উঠিয়া অর্থসুখ উপভোগ করিবার অবকাশ পায় না। অতিরিক্ত পরিশ্রমে দেহমন ভাঙ্গিয়া পড়ে; কেহ কেহ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়; কাহারও মহাদুঃখে জীবনের অবসান ঘটে। পূর্ণ স্বাস্থ্য লাভ করিয়া বিপুল ধনসম্পদের অধিকারী হইয়াও যদি কাহারও মনোদুঃখে কাল কাটাইতে হয়, মানুষের সঙ্গে তিক্ততা থাকে, নিজের প্রতি অসন্তোষ জন্মে,

তবে ধন সম্পদ থাকিয়াও নাই, বুঝিতে হইবে। মনের আনন্দ লুপ্ত হইলে সমগ্র জীবনই ব্যর্থ হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। যখন ধনহানি হয়, ইহাকে সামান্য ক্ষতি বলিয়া বোধ হয়, যখন স্বাস্থ্য নষ্ট হয়, জীবনের অনেকটা হানি হইয়াছে, বুঝিতে হইবে, কিন্তু যখন মনের শান্তি তথা আনন্দ নষ্ট হয় তখন সমগ্র জীবনই বিনষ্ট হইয়াছে বলিয়া জানিবে।

উপনিষদের মর্মবানী **শ্রীমতি নমিতা রায়চৌধুরী**

উন্মেষ – বিকাশ - ও পরিণতি।

মানুষের জন্মগত একটা বিশেষ অনুসন্ধিৎসু জিজ্ঞাসু মন আছে। সে কিছুতেই বাইরের দৃশ্যমান বস্তুতে সন্তুষ্ট থাকে না। সে যাহা কিছু পায়, বোঝে অনুভব করে তাতে তার মন ভরে না, তার খালিই মনে হয় আসল জিনিষটি সে এখনও পায় নাই। কি যেন একটু ফাঁক আছে। সে দেখে আর ভাবে একটা লোক – পশু - পাখী এই তো ছিল; চলছিল ফিরছিল। এর মধ্যে তার কি হল? সে নড়েও না চড়েও না, স্থির হয়ে পড়ে আছে, তার হাত পা সমস্ত শরীর যেমন ছিল তেমনিই তো আছে, তবুও তার কিসের অভাব হোল যে সে আর এখন কিছুই করতে পারেনা, তাকে যতই আঘাত করলেও সে চুপ করে থাকে, কিছুক্ষণ পর তাও একটু একটু নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। তাহলে শরীর ছাড়া এমন একটা জিনিষ আছে সেটার জন্য তারা নড়ে চড়ে বেড়াতে পারে; সেটা চলে গেলে সবই গেল, শরীরটা কিন্তু পড়ে রইল। আবার দেখ এই যে চারিদিকের গাছপালা - তারা ক্রমে ক্রমে বড় হয়, পাতা গজায় ফুল ফোটে ফল ধরে। কিছু কাল পরে আর কিছুই হয়না, সব শুকিয়ে যায়-ঝরে যায়, পড়ে যায়। আরও একটা কথা – তারা তো নড়ে চড়ে বেড়াতে পারেনা, একই জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকে, এই বা কেন? সে ভাবে গাছ পালার চেয়ে তাহলে মানুষ পশু পাখী

সকল প্রাণীর আরও একটা বিশিষ্ট জিনিষ আছে যার জন্য তারা নড়ে চড়ে ঘুরে ফিরে বেড়াতে পারে। তাছাড়া মানুষ ও অন্যান্য প্রাণী গলার মধ্য দিয়ে আওয়াজ করতে পারে। গাছ পালার সে ক্ষমতা নেই। এই বা কেন?

এমনি করে মানুষের অনুসন্ধিৎসু-জিজ্ঞাসু মন একটু একটু করে জীবন ও চৈতন্যের সন্ধান পায়। কিন্তু সে তবুও মনে তৃপ্তি পায়না।

পাহাড়, পর্বত - কোনটা বা আগুন উগরে দিচ্ছে - কোনটা বা আকাশ ছোঁয়া বেড়ে উঠেছে। নদ নদী, সমুদ্র দিনরাত ছুটে চলেছে, কখনও চারদিকে ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে - কখনও বা শান্ত। আকাশে মেঘ হচ্ছে। তা থেকে বৃষ্টি পড়ছে। বজ্র-বিদ্যুৎ-ঝড়-বায়ু অদ্ভুত শক্তিশালী আগুন-এসব কি? কোথা থেকে আসে? কে এদের চালায়? আর আকাশে ঐ যে আশ্চর্য জ্বলন্ত 'গোলাটা' ওটা আলোয় আর আগুনে চারিদিক ভরিয়ে দেয়। রোজই ঠিকমত আকাশে দেখা যায়। আবার যখন ডুবে যায় তখন আকাশে ছোট ছোট কত ঝিকঝিকে জিনিষ ফুটে ওঠে। কখনও বা একটা খুব সুন্দর আলোয় ভরা শান্ত গোলাকার চেহারা দেখা দেয়। এ সবই বা কি? এরা কারা? কোথা থেকে আসে? কোথায় যায়? এই ভাবে সূর্য-চন্দ্র-তারকারাজি, নদ, নদী পাহাড় পর্বত বজ্র বিদ্যুৎ আলো অগ্নি বৃষ্টি জল প্লাবন আগ্নেয়গিরি এইরূপ বিবিধ এবং বহুবিধ প্রাকৃতিক ও নৈসর্গিক পদার্থ এবং ঘটনায় তার মন কখনও যে হর্ষে, আনন্দে উৎফুল্ল হয় কখনও বা আতঙ্কে ও বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়। তার মন কখনও ভয়ে কখনও বা প্রীতিতে ভরে যায়। সে বুঝতে পারে যে এরা ভালও করে মন্দও করে। এরা উপকারও করে অনিষ্টও করে। সে ক্রমশঃ ইহাও অনুভব করে এবং বোঝে যে এরা একটা নিয়মের অধীন। ইহাদের একজন সর্বনিয়ন্তা কর্তা আছেন। কিন্তু কে সে ব্যক্তি? সূর্যের আলোয় পত্র-পুষ্প লতা পাতায় সৌন্দর্যে নদ নদী সমুদ্র পাহাড় পর্বতের গভীর গাম্ভীর্যে তার মন ভরে ওঠে। তাতে সে যেন সেই

সর্বনিয়ন্তার ইশারা পায়। তার মনে দোলা দেয়। তাই জানবার চেষ্টা বা পাওয়ার কৌতূহল আর থামেনা। সেই অজানা জিনিষটিকে জানবার জন্য তাই সে পাতি পাতি করে অবিরাম খুঁজে বেড়ায়।

সুখ স্বাচ্ছন্দ্য, বিলাস বৈভব - কিছুতেই সে পরিপূর্ণ আনন্দ ও সুখ পায়না। কাকে যেন পাওয়ার জন্য তার মন প্রাণ হাহাকারে ভরে ওঠে। সেই না পাওয়া জিনিষটিকে খুঁজতে খুঁজতে একদা সে যিনি অন্তরে বাহিরে সর্বত্র ব্যাপ্ত - যিনি অন্তরতম, যাঁহার সত্যে আমরা সত্য যাঁহার আনন্দে আমরা ব্যক্ত, যে সর্বব্যাপী আনন্দের দ্বারা তারা তাঁহাতে বিলীন হচ্ছে সেই 'সত্যং জ্ঞানমন্তং আনন্দং' ব্রহ্মকে জেনে ধন্য হল। সে জানল যে "এষাস্য পরমাগতিঃ এষাস্য পরমাসম্পৎ এষোহস্য পরমোলোকঃ এষোহয্য পরম আনন্দঃ।" যিনি জীবের পরম-গতি, পরম-সম্পদ, পরম-লোক, পরম আনন্দ - সেই কল্যাণরূপী 'এক' এবং অনন্ত সমুদয় আকাশ বাতাস জগৎ চরাচর পরিব্যাপ্ত করিয়া স্তব্ধ হইয়া রহিয়াছেন। সে আরও জানল যে সেই পুরুষে - সেই আনন্দে এ সমস্তই পূর্ণ। জগতের সকল বহুত্ব মধ্যে এই 'ধ্রুব'কে সকলের ঈশ্বর সকল জীবের অধিপতি, পালন কর্তা, সকলের চেয়ে প্রিয় এবং অন্তরতম পরমাত্মা বলিয়া জানল। তিনি এক এবং অনন্ত, তিনি মহান, তিনি জ্যোতির্ময়, তিনি সত্য, ইহাই সে জানল। তাই এক দিব্য প্রভাতে ভারতের তপোবনে এক সত্যান্বেষী ব্রহ্মবিদ্ মহর্ষি এই অনন্তের বার্তা উদাত্ত কণ্ঠে বিশ্বের নিকটে ঘোষণা করলেন -

"হে অমৃতের পুত্রগণ! তোমরা যারা দিব্যধামে আছ সকলে শোন আমি সেই জ্যোতির্ময় মহান পুরুষকে জেনেছি - 'শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা, আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থূঃ। বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্ আদিত্য বর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।'

সূর্য-বর্ণ জ্যোতির্ময়কে আমি জেনেছি। অজ্ঞান মোহের অন্ধকারের পরপার হতে তাঁকে দেখেছি। আমি জেনেছি - আমি পেয়েছি। এই পাওয়া - এই লাভই সকলের শ্রেষ্ঠ লাভ, এই লাভই ব্রহ্ম লাভ।

'ইহচেৎ অবেদীৎ অথ সত্যমস্তি ন চেৎ ইহ অবেদীৎ মহতী বিনষ্টিঃ।'

- এঁকে যদি জানা গেল তবেই সত্য লাভ হল। এঁকে যদি না জানা গেল তবে মহতী বিনষ্টি - অর্থাৎ মহা বিনাশ।

তাই তো মৈত্রেয়ী স্বামীর দেওয়া বিষয় সম্পত্তি ঠেলে ফেলে দিয়ে বলে উঠেছিলেন- যে সম্পদের দ্বারা আমি অমৃত লাভ করতে পারব না তা নিয়ে আমি কি করবো? - 'যে নাহং নামৃতা স্যাম্ কিমহং তেন কুর্য্যাম্?' সংসারের সকল কাম্য-ফলপ্রদ লক্ষ্মীকেই না হয় লাভ করলে, তাতেই বা কি? শত্রুজয় করলে, বহু সুহৃদ-বন্ধু পেলে, দেহধারীদিগকে না হয় আরও কিছুদিন বাঁচিয়ে রাখলে, তাতেই বা কি? 'ততঃ কিম?' তারপর কি? যাহা অসার-অনিত্য জলবিম্বের ন্যায় ক্ষণস্থায়ী তাতে প্রকৃত সুখ কোথায়?

যিনি পূর্ণ-সম্পূর্ণ, যিনি সত্যস্বরূপ, অনন্ত, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, শোক, মোহ, জরা-মৃত্যুর অতীত, যিনি বিজ্ঞান স্বরূপ, আনন্দস্বরূপ, যিনি 'ভূমা', তাঁর অন্বেষণে তাঁকে জানায় তাঁকে পাওয়ায় পরম এবং চরম সুখ শান্তি আনন্দ নির্বাণ ও মোক্ষ।

তাই নচিকেতা ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসু হয়ে যমের কাছে গেলে যম তাঁকে মরণের রহস্য জানার পরিবর্তে পার্থিব সকল সুখ, বিত্ত, দীর্ঘজীবন, সসাগরা ধরণীর অধীশ্বর হওয়া এবং ইহার অনুরূপ যে কোনও অভিলষিত 'বর' - পৃথিবীতে যে যে কাম্যবস্তু দুর্লভ - মানুষে যাহা কখনও পায় না, তাহা সবই দিতে রাজী হলেন এবং

নচিকেতাকে বহু প্রলোভন দিলেন। কিন্তু নচিকেতা তাহাতে কিছুমাত্র প্রলুব্ধ হলেন না। তিনি বললেন "বিত্তের দ্বারা মানুষের কখনও তৃপ্তি হয় না। আমি ইহা চাই না। আমি কেবলমাত্র ব্রহ্মবিদ্যা উপদেশের "বরই" প্রার্থনা করি। হে যম! যে যে বিষয়ে সকলের সন্দেহ-যা মরণের পরপারের সঙ্গে সংযুক্ত সেই প্রশ্নের উপদেশ আমার বরণীয়। নচিকেতা অন্য বর চায়না – 'নানন্ত্যং তম্মোন্নচিকেতা বৃণীতে'। উপনিষদে সেই "ব্রহ্মই" মুখ্য প্রতিপাদ্য বিষয়। উপনিষদ্ সেই সর্বনিয়ন্তা-সর্বকর্তা-সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কর্তা -সেই সত্যম্ জ্ঞানমন্তম আনন্দং ব্রহ্মকে জানবার এবং জীব-জগত ও ঈশ্বর সম্বন্ধীয় সত্যের উপদেশ দেন। উপনিষদ জীব ও জগতের পরস্পর সম্বন্ধ- ঈশ্বরের সহিত জগতের ও জীবের সম্পর্ক-জগতের সৃষ্টি-স্থিতি, লয় প্রকৃতির বিকাশ ও পরিণতি, জীবের উন্নতি ও অবনতি, লক্ষ্য ও গতি, বিকাশ ও বিরাম, বন্ধন ও মোক্ষ, ব্রহ্মের স্বরূপ ও বিভাব, প্রকাশ-শক্তি ও অভিব্যক্তি ইত্যাদির তত্ত্বজ্ঞানরাশি, ব্রহ্মপ্রাপ্তির ফল ও মৃত্যুর পরে আত্মার গতি সম্বন্ধে সকল তথ্য মানব গোচরে আনেন।

"সূর্য্য অস্ত গেলে বুঝতে পারি সূর্য্যদেবই সংসারের চক্ষু। সূর্য্য বিনা সংসার অন্ধকার।"

--- বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

সুইজারল্যান্ডের দুই পাহাড়ে **শ্রী অরূপ কুমার ভট্টাচার্য্য**

টপ অফ ইউরোপ - তাও আবার ট্রেনে চেপে! ভাবতেই কেমন শিহরণ জাগেনা? বিশেষতঃ জায়গাটা যদি সুইজারল্যান্ডে হয়। তবে শুধু এই সুইট ল্যান্ডে নয়, স্মাইলস পার মাইলসের ২৪ জনের একটা দলের সাথে ভিড়েছিলাম ১৩ দিনে ইউরোপের কিছু সিলেক্টেড জায়গা দেখতে। প্রথমে লন্ডন তারপর প্যারিস হয়ে এখন এসেছি আল্পসের পায়ের নীচে সুইজারল্যান্ডের এক পাহাড়ি গ্রাম এঞ্জেলবার্গে। নিকটতম শহর বলতে ৩৫ কিলোমিটার দূরের আরেকটা ছবি লুসার্ন। সেখানেও আমরা যাব নিশ্চয়ই, তবে আমাদের হোটেল Bellevue-র বারান্দা থেকেই যখন আল্পসের বরফ চূড়া দৃশ্যমান, আর ভ্রমণ সূচীর টিটলিস এবং জংফ্রাউচ (JUNGFRAUJOCH) যখন এখান থেকেই সহজসাধ্য, তখন দুটো রাত তো 'বেল্লেভ্যু'তে কাটানোই যায়! শুধু কি তাই? ১২ শতকের 'Benedictine' মনাস্ট্রি, লেক, স্টেশন এঞ্জেলবার্গ আর পশ্চাৎপটে বরফ মুকুটে শোভিত আল্পসের বিস্তার - ক্যামেরাকে আর বিশ্রাম নিতে দেয়না। ফলাফলে যে সমস্ত ছবি ওঠে, প্রত্যেকটাই একেকটা পিকচার পোস্টকার্ড! টিটলিস আমাদের ঘরের কাছে আর জংফ্রাউচের স্টার্টিং পয়েন্ট Grindelwald প্রায় ১০৫ কিলোমিটার। তাই দূরের ডাকে আগে সাড়া দিতে প্রথম দিনেই উঠেছিলাম ইউরোপের মাথায়। সকাল নটায় আমাদের ২৪ জনকে নিয়ে ৫২ সিটের লাক্সারি বাস এঞ্জেলবার্গ থেকে গ্রিনডেলওয়াল্ডের দিকে রওনা হওয়ার পরই বুঝতে বাকি থাকেনা যে আমরা সুইজারল্যান্ডের রাস্তায় রয়েছি। লেক আর বরফমাখা পাহাড় গুলো প্রায়ই চোখের আড়ালে চলে যাচ্ছিল একের পর এক পাহাড়ি টানেল বাসের পথটাকে গিলে ফেলায়। ১১টার একটু আগেই পৌঁছে

সেলাম গ্রিনডেলওয়ালড টার্মিনালে। এখান থেকেই শুরু হবে আমাদের জংফ্রাউচ অভিযান।

টপ অফ ইউরোপে আমাদের জন্য ছিল একটা অপশনাল ট্যুর। ২২০ ইউরো অর্থাৎ জনা প্রতি প্রায় ২১,৫০০ টাকা দিয়ে 'কি আর এমন দেখব' ভাবনাটা আল্পসের হিমবাহে লুকিয়ে পড়ল যখন 'ইগার এক্সপ্রেস' নামের গন্ডোলা কেবল কার ৭৬১১ ফুট উচ্চতার ইগার-গ্লেটসচার (Eigergletscher)-এর দিকে উঠতে শুরু করলো। প্রথমে এক বয়ে যাওয়া নদী, তারপর সবুজ বুগিয়াল পার হয়ে বরফের অন্দর মহল - গন্ডোলার স্বচ্ছ আবরণ ১৫ মিনিটের এই উত্তেজক রাইডকে এতটাই মোহময় করে তোলে যে পরিবর্তনশীল দৃশ্যগুলোকে ক্যামেরা বন্দি করার কথাও মনে থাকেনা। অবশেষে ইগার-গ্লেটসচার, যাকে আবার টপ অফ ইগার ও বলা হয়, পৌঁছাতেই শেষ হয়ে যায় আজকের যাত্রার প্রথম পর্ব। দ্বিতীয় পর্বের শুরুও হয় এখান থেকে, যখন এখানকার প্ল্যাটফর্মে এসে পৌঁছায় 'JUNGFRAU' রেলওয়ের কগহুইল ট্রেন। ট্রেন আসছে ইন্টারলেকেন থেকেও। তবে সেখান থেকে যারা সোজাসুজি ট্রেনে জাংফ্রাউচ পৌঁছাবেন, খোলা আকাশের নীচে ছুটন্ত ট্রেন থেকে বাইরের শোভা তারা উপভোগ করবেন বটে, কিন্তু ইগার এক্সপ্রেসের রোমাঞ্চ থেকে বঞ্চিত হবেন নিশ্চিত ভাবেই। এই প্রসঙ্গে বলা যায় ইগার গ্লেসচারই খোলা আকাশের নীচে এ পথের শেষ স্টেশন। এরপরেই ট্রেন চলে সুড়ঙ্গ পথে একেবারে জংফ্রাউচ পর্যন্ত। স্টেশনে কিছুক্ষণ সময় পেয়েছিলাম, কিন্তু সে সময়টায় প্ল্যাটফর্মের কাঁচের পিছনে হিমবাহ সমেত সকলে ফটো তুলতে না তুলতেই দেখা গেল লাল রঙের ঝকঝকে ট্রেন প্ল্যাটফর্মে ঢুকছে। আমাদের দলটার জন্য রিজার্ভ ছিল কোচ নাম্বার 'E'; সেখানে সকলে ভালভাবে গুছিয়ে বসতেই ট্রেন ছুটলো সামিট স্টেশনের

পথে। সুড়ঙ্গ রেলপথে যাত্রা সময় ঠিক ২৬ মিনিট, অবশ্য এর সাথে যোগ করতে হবে মাঝে EIGERWAND স্টেশনে (৯৩৯৬ফুট) মিনিট পাঁচেকের বিরতি। এখানেও রয়েছে ভিউ পয়েন্ট। আমাদের মতো সিনিয়র সিটিজেনরা ভরসা না পেলেও উৎসাহী তরুণ-তরুণীর দল দিব্যি ভিউ পয়েন্ট থেকে ছবি তুলে ফিরে এসেছিল ট্রেনের কামরায়। ঠিক বেলা ১২টা ১৫ তে পৌঁছে গেলাম টপ অফ ইউরোপ 'জংফ্রাউচ' স্টেশনে। সে কি উত্তেজনা! ইউরোপের সর্বোচ্চ রেল স্টেশন, যেখানকার ১১.৩৩৩ ফুট উচ্চতার ভিউ পয়েন্ট থেকে দেখা যায় ১৩,৬৪১ ফুটের জংফ্রাউচ শৃঙ্গ। MONCH (১৩৪৮০ ফুট) এবং জংফ্রাউচ শৃঙ্গ জয়ের সাধারণ রাস্তাও শুরু হয়েছে এখান থেকে। ইউরোপের সর্বোচ্চ পোস্ট অফিস এই রেলস্টেশনেই জেনে যেমন সমৃদ্ধ হয়েছি, তেমনি গর্বিত হয়েছি এই জন্য যে ইউরোপ টপ পোস্ট অফিস কিন্তু আমাদের দেশের HIKKIM-কে (১৪,৫৬৭ ফুট) টেক্কা দিতে পারেনি। ২০০২ সাল থেকে অবশ্য জংফ্রাউচ পোস্ট-অফিস বন্ধ হয়ে গেছে, তবে লালরঙের পোস্টবক্স কিন্তু আজও বর্তমান। আর রয়েছে পৃথিবীর আবহাওয়া পর্যবেক্ষণের উদ্দেশ্যে তৈরী অ্যাটমসফেরিক রিসার্চ স্টেশন এবং ইউরোপের সর্বোচ্চ রেডিও রিলে স্টেশন। রেডিও স্টেশনে অবশ্য আমাদের প্রবেশাধিকার ছিলনা কিন্তু টপ অফ ইউরোপের রেল স্টেশন থেকে সিঁড়ি ভেঙ্গে বরফের রাজ্যে গিয়েই বা আমরা কি পেলাম? এক কথায় তুমুল বরফ বৃষ্টির সাথে ঝোড়ো বাতাসের তাণ্ডব। চারিদিক শুধু সাদা আর সাদার মধ্যে রঙের ছোঁয়া শুধু সুইজারল্যান্ডের লালপতাকার সাথে টপ অফ ইউরোপ লেখা JONGFRAUJOCH সাইনবোর্ডে। সকলেই যে সেখানে সেলফি তুলতে চাইবে সেটা স্বাভাবিক, কিন্তু গ্লাভসের তলায় অবশ ঠান্ডা হাত ফটো নিতে দিলে তো! আমাদের ফটো অবশ্য তুলে দিয়েছিল দলেরই এক সঙ্গিনী, কিন্তু দাম হিসেবে তাকে ফেলে আসতে হয়েছিল বাত্যাতাড়িত বিগড়ানো ছাতাটি। জংফ্রাউচের কাছে ভক্তের

নিবেদন বলতে পারেন। জংফ্রাউচে হাড়হিম অভিজ্ঞতা হয়েছে এখানকার আইস প্যালেসে এসে। ইনটারলেকেন অথবা গ্রিনডেলওয়াল্ডে অবশ্য আইস প্যালেস আছে, এমন কি কিছুটা অন্য ধরনের হলেও স্নো-ওয়ার্ল্ড রয়েছে আমাদের হায়দ্রাবাদেও। কিন্তু ALETSCH গ্লেসিয়ারের ৩০ মিটার নীচে মাইনাস তিন ডিগ্রী তাপমাত্রায় ১৯৩০ সালের পর্বত গাইড চো যে প্যালেস গড়েছিল, পরবর্তী কালে পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত সেই হিম ঘরে বরফের আর্টিস্টিক মূর্তি প্রত্যক্ষ করার অনুভূতিই আলাদা।

হোটেলে ফেরার আগে ছবির মত দুই লেক THUN আর BRIENZ -এর মাঝখানের শহর ইনটারলেকেনে বৃষ্টি ভেজা দিনটা কেমন কেটেছিল, সে গল্প অন্য কোথাও বলা যাবে, এখন শুনুন পরদিন সুইজারল্যান্ডের আরেক পাহাড় টিটলিস অভিযানের গল্প।

টিটলিসের বরফ চূড়া যে হোটেলের বারান্দার সাথে ফিসফিস করে কথা বলে সেটাতো আগেই বলেছি, তাই আজ যখন সত্যিই তার ডাকে সাড়া দেওয়ার সময় এসে গেল, মনতো নেচে উঠবেই। সমস্যা করতে পারতো গতরাত থেকে টিপটিপ করে নাগাড়ে হয়ে চলা বৃষ্টি। তবে এটা এখানকার স্বাভাবিক ঘটনা, তাই বাস যথাসময়েই নিয়ে এল এঞ্জেলবার্গ কেবল স্টেশনে। প্রসঙ্গত বলে রাখি সুইজারল্যান্ডের অন্য কোথাও থেকে যারা টিটলিসের মাথায় চড়তে আসেন, তাদেরও ট্রেন অথবা গাড়িতে প্রথমে আসতে হয় এই এঞ্জেলবার্গের স্টার্টিং পয়েন্টে। টিকিট স্ক্যান করে প্ল্যাটফর্মে দাঁড়াতেই সামনে একের পর এক চলমান কেবল ক্যাপসুল। TITLIS নামাঙ্কিত কেবলকারগুলো আট সিটের হলেও সাধারন ভাবে চারজনের বেশি তাতে চাপতে দেখিনি। এমন কি হানিমুন কাপ্‌লরা পুরো ক্যাপসুলটাই দখল

করে নিচ্ছে এমন ঘটনাও আকচার ঘটছে। সমস্যা নেই- ক্যাপসুলের সরবরাহ যে অফুরন্ত!

এঞ্জেলবার্গের ৩৩৯৯ ফুট থেকে ৭৯৬৬ ফুট উচ্চতার স্টেশন 'স্ট্যান্ডে'র দিকে উঠতে শুরু করতেই পায়ের নীচে যেন এক টুকরো স্বর্গ। লেক সমেত স্বর্গটা ক্রমশঃ দূরে সরে গেলে TRUBSEE তে ক্ষণিকের বিরতি। সেখানে কাউকেই নামতে দেখলাম না। প্রথম নেমে এলাম ঐ স্টেশন 'স্ট্যান্ডে'ই। এখানেই যাত্রা বদল করে চাপতে হয় ৭৫ যাত্রীর বিশাল গোল কেবলকার TITLIS ROTAIR -এ। সকলেই চায় ৩৬০° তে ঘূর্ণায়মান এই ROTAIR-এর কাঁচের দেওয়ালের দিকে মুখ করে দাঁড়াতে। স্বাভাবিক, ক্যাপসুলের মাঝখান থেকে তো সবুজ বুগিয়াল কি ভাবে ক্রমশ সাদা হিমবাহ হয়ে উঠছে তা দেখা যাবেনা। এঙ্গেলবার্গ থেকে টিটলিসের শেষ স্টেশন পৌঁছাতে দুই পর্যায় মিলে কেবল কার যাত্রা মোটামুটি তিরিশ মিনিটের। যাত্রা সংক্ষিপ্ত হলেও অসাধারণ দৃশ্যের কারণে এ যেন সারা জীবনের সঞ্চয়। ROTAIR থেকে দেখা যায় সবুজের অভিযান কেমন থমকে গেছে লেকের ওপারে বরফ দেখে। সবুজ গাছ, নীল লেক, কালো পাথর আর সাদা বরফ - অর্থাৎ এক ফ্রেমে চার রং - এককথায় অপূর্ব। রোটেয়ার থেকে নেমে আসার পর সে যেন এক বিগবাজার। সুইসঘড়ি, সুইস আর্মি নাইফ, চকোলেট সমেত নানান স্যুভেনির শপ আর রেস্তোঁরা নিয়ে সে যেন এক হট্টমেলা। সেখানে কিছুটা সময় কাটিয়েছিলাম বটে, তবে সেটা ফিরতি পথে। এখন চলতে হবে লিফট অথবা সিঁড়ি বেয়ে এক্কেবারে ফিফ্থ স্টেজে ৯৯৩৪ ফুট উচ্চতার ক্লেইন টিটলিসের হিমবাহে। সর্বোচ্চ বিন্দু মাউন্ট টিটলিস অবশ্য আরো প্রায় ৭০০ ফুট উপরে কিন্তু এখানেই এমন সব পেয়েছির আসর যে ১০৬২৩ ফুটের মাথায় চাপার কোন চেষ্টাই আমরা করিনি। কি নেই এই

রূপকথার রাজ্যে? হিমবাহের উপর দিয়ে প্রায় উড়ে চলার রোমাঞ্চ পেতে পারেন খোলা চেয়ার লিফ্ট আইস ফ্লায়ারে। ৬ সিটের চেয়ারে বসে যতদূর দেখা যায় শুধু বরফ আর বরফ- এ এক অসাধারণ অভিজ্ঞতা।

তারপর যখন আইস ফ্লায়ার আপনাকে পৌঁছে দেবে গ্লেসিয়ার পার্কে, তখন নানান স্নো-অ্যাকটিভিটিতে মেতে উঠে মনে হবে জীবনটা শুধু মজ্জাই মজা। আর রয়েছে টিটলিস ক্লিফ ওয়াক।

সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে ৯৮৪২ ফুট উচ্চতায় এই ঝুলন্ত সেতুর দৈর্ঘ্য ৩২০ ফুট হলেও প্রস্থ মাত্রই ১ মিটার। মিথ্যেই কি আর ৭-১২-২০১২-তে চালু হওয়া ব্রিজ এর মধ্যেই বিশ্বের অন্যতম ভয়ঙ্কর হিসেবে পরিচিতি পেয়ে গেছে। পর্যটকেরা যেমন সাবধানী পায়ে সাসপেনশন ব্রিজের ওপর থেকে দেখেন নীচের হিমবাহের শোভা তেমনি এ পথ ব্যবহার করে পর্বতারোহীরাও। বরফশৃঙ্গ জয়ের বাসনা যাদের শয়নে স্বপনে, তাদের কথা জানিনা, তবে আমাদের মত সাধারণ পর্যটকের কানে যখন বাতাস শিস দিয়ে কথা বলে, তখন পালসরেট আর হৃৎস্পন্দন বেড়ে গেলেও চোখের সামনে পাহাড় চূড়া আর হিমবাহ দেখে মন বলে ওঠে - এই তো জীবন!

অ্যাডভেঞ্চারে যারা মাততে চাননি, বরফের দেশে তাদের বয়সও পৌঁছে গেছিল ছেলেবেলার দিনে। কেউ ছুঁড়ছে বরফের গোলা আবার কেউ বা ফটো তোলাবে বলে তৈরী করছে বরফের বল। বরফের ওপর গড়াগড়ি দেওয়ার লোকেরও অভাব ছিলনা সেই চির ছেলেমানুষের দেশে। কিন্তু সে তো কেবল কিছুক্ষণ। সময় ফুরিয়ে আসছে বলে লিফটে নীচের বোতাম টিপতেই হয়। সেখানেও রয়েছে কুড়ি মিটার গ্লেসিয়ারের তলায় ১৫০ মিটার লম্বা মায়াবী আলোর গ্লেসিয়ার কেভ।

জংফ্রাউচের আইস-প্যালেসের মত না হলেও ঠান্ডা এখানেও হাড় কাঁপিয়ে দেয় - মাইনাস ১.৫ ডিগ্রী! তাই সেই ম্যাজিকাল ওয়ার্ল্ডেও খুব বেশি সময় না থেকে চলে আসি তথাকথিত বিগবাজারে। কিনি অথবা নাই কিনি দেখাশোনা তো বিলকুল ফ্রি!

নীচে নেমে আসার সময় রোটেয়ারে নতুন কিছু না ঘটলেও টিটলিস কেবলকার আমাদের মাতিয়ে দিল মাটিতে নামার মিনিট দুয়েক আগে। সেখান থেকে দেখা আপন বেগে পাগলপারা হয়ে বয়ে চলা নদীর নাম যে ENGELBERGER Aa সেটা অবশ্য পরে জেনেছি, তখন আকর্ষিত হয়েছিলাম তার ছুটে চলার ছন্দে। এতটাই তার সম্মোহিনী ক্ষমতা যে কেবল থেকে নেমে আসার পর তার কাছে দৌড়ে না গিয়ে পারিনি। নদী পারাপারের জন্য রয়েছে ছোট্ট সুন্দর এক সেতু। তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে দেখছিলাম লুসার্ন লেক থেকে বয়ে আসা এই স্রোতস্বিনীর টিটলিসকে ছোঁয়ার চেষ্টা। লুসার্ন লেক, যে লেককে কেন্দ্র করে ছবির মত সুন্দর শহর লুসার্ন- আমাদের পরের গন্তব্য। কেন জানিনা মনে হলো নদীর 'ডাকে'ই সে পাঠিয়েছে তার নিমন্ত্রণের চিঠি। সাড়া যে আমাদের দিতেই হবে।

হোটেল বেলেভ্যু, এঞ্জেলবার্গ

পথের দৃশ্য

পথের দৃশ্য

টিটলিস-এর পথে

টিটলিস-এর পথে

পথের শেষে

গ্লেসিয়ার কেভ

ফেরার পথে

সতর্কতা

সুনন্দন ঘোষ

বড় সুখের এই জমি—
সাগর পাহাড় মরুভূমি বনাঞ্চল ----
আর পুরোনো বিশ্বাসে ডুবে থাকা লাখো লাখো সরল মানুষ।

অকিঞ্চন কাঙালেরা বারবার হানা দেয় খিদের তাড়নায়।
যুগ বদলায়, ভেক বদলায়, স্ব-ভাব বদলায় না।
বরফের দেশ থেকে আসুক, আর মরুভূমি থেকে,
সমুদ্র পেরিয়ে আসুক বা পাহাড় পেরিয়ে,
ভাষা, সমাজ, স্বজন ছেড়ে আসে তো লালসায়!
কারও হাতে তরোয়াল, কারও ঝোলায় ধর্মের কিতাব।
বাড়তে থাকে গণিমতের মাল, বাড়তে থাকে সন্তান-সন্ততি,
বেড়ে ওঠে জায়গীর ------
বৈদিক সভ্যতার ভদ্রাসনে তৈরি হয় অনুপ্রবেশকারীর সাম্রাজ্য।

এখন ফিরে পাওয়ার সময়, সময় সতর্কতার।
হাজার বছর ধরে জমির কোণায় কোণায় বাসা বেঁধে আছে উদ্বৃত্ত প্রজন্ম ।
কাঁটাতারের তলা দিয়ে অনুপ্রবেশের পথ করে দেয় তারা।
কখনো ঝলসায় বন্দুক, কখনো শোনায় সাম্যের গান।
কিন্তু আর কোতোয়ালের গাড়িতে মাতৃমূর্ত্তি বিসর্জন নয়,
রাজ্ঞীর অনুপ্রেরণায় অভয়াকে অগ্নিশিখায় পাঠানো নয়,
উদারতার ব্যর্থতা নয়,
দাঁতে দাঁত চেপে ঠেলে রাখতে হবে ঘরের আগল।